OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 185 - 192
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের বয়ান

দেবব্রত খাঁড়া
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: khanradebabrata08@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Marginalized Life, Bengali Fiction, Dalit Literature, Subaltern Representation, Social Marginalization, Poverty and Deprivation, Labour and Struggle, Folk Culture, Human Dignity.

Abstract

Although the lives of marginalized, neglected, and deprived people remained largely overlooked in Bengali fiction for a long time, changing social conditions gradually brought the lives, struggles, and existential concerns of the socially marginalized and lower classes into the domain of literary representation. In this context, the fiction of Anil Gharai constitutes a distinctive and significant contribution. In his novels, the people located at the 'periphery' rather than the so-called 'centre' of society occupy the central position of the narrative. Poverty, labour, social discrimination, occupational identity, folk customs, culture, superstition, struggle for survival, existential crisis, and the aspiration for human dignity constitute the major concerns of his novels.

The present study analyses the multidimensional representation of marginalized life in selected novels of Anil Gharai, including Nunbari (1989), Banabasi (1990), Mukul-er Gandha (1993), Koler Putul (1996), Megh Jiboner Trishna (1996), Dourbogarar Upakhyan (1997), Neel Dukkher Chhobi (2001), Biporit Juddher Mohora (2001), and Samne Sagar (2003). These novels portray, in diverse ways, the lives and occupations of salt-makers, sweepers, cobblers, members of the Hari community, pig herders, Adivasi communities, Kakmara people, leather traders, landless labourers, and fishing communities. Thus, the marginalized society represented in his novels does not constitute a homogeneous group; rather, it creates a vast and diverse social world consisting of multiple classes, communities, occupations, and voices.

One of the major foundations of Anil Gharai's literary distinctiveness is his intimate knowledge and direct experience of marginalized life. His close familiarity with rural and working-class communities lends realism and authenticity to his characters, settings, and narratives. In his novels, marginalized people are not merely objects of pity; they emerge as resilient, self-respecting individuals who struggle to survive and preserve their dignity in adverse circumstances. At the same time, the careful representation of their dialects, occupations, customs, folk beliefs, and cultural practices enhances the documentary and ethnographic dimension of his fiction.Therefore, the representation of marginalized life in Anil Gharai's novels is not merely a

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

depiction of poverty and deprivation; it is a multidimensional literary articulation of the lives, cultures, labour, aspirations, struggles, and human existence of people living at the social margins. Through the originality of his subject matter, distinctive perspective, and realistic artistic representation, Anil Gharai has made a significant contribution to the portrayal of marginalized life in Bengali fiction.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের মূলধারায় দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজের জীবনযাপন, সংকট, মূল্যবোধ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব অধিক গুরুত্ব পেলেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। সমাজের তথাকথিত 'কেন্দ্র'-এর পাশাপাশি 'প্রান্ত'-এর মানুষও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। যাদের জীবন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা কারণে মূলধারার বাইরে অবস্থান করে, তাদের জীবনসংগ্রাম, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, শ্রম, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং অস্তিত্বের সংকট সাহিত্যে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্যে অনিল ঘড়াইয়ের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই নিম্নবর্গের জীবনচর্যার সংবেদী ভাষ্য রচিত হয়েছে। সমগ্র জীবন জুড়ে তিনি যে বিষয়টি নিয়ে ভেবে গেছেন সেই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু এবং পরিধি সবটাই হল অন্ত্যজজীবনকে নিয়ে। অন্ত্যজজীবনের স্বরূপকে তুলে ধরবেন, তার প্রকৃতিকে বিবৃত করবেন - এই অভিপ্রায় নিয়ে তিনি একের পর এক উপন্যাস লিখে গেছেন। তাঁর আজীবন সাহিত্যসাধনার সাধন বস্তুটি ছিল নিম্নবর্গের জীবন এবং সেই জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়। একের পর এক উপন্যাস রচনার ভিতর দিয়ে তিনি অন্তেবাসী মানুষদের বিরাট ভুবনের অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। এক কথায় অনিল ঘড়াই বাংলা উপন্যাসের জগতে অন্ত্যজ জীবনের 'বিরাট পর্ব' রচনা করেছেন।

অনিল ঘড়াইয়ের প্রত্যেকটি লেখাই বিচিত্রমুখী। অন্ত্যজ সমাজের বিচিত্র শ্রেণির মানুষের কথা, বিচিত্র পেশার কথা উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাস-গল্পে। তাঁর সৃষ্টির সংসারের চরিত্রদের মধ্যে কেউ ভিক্ষাজীবী, কেউ চামার, কেউ তাঁতি, কেউ ঠিকাদারের শ্রমিক, কেউ রেলের গ্যাংম্যান, কেউ ওঝা, কেউ আবার চোর। এদের মধ্যে আবার কেউ নোনাজল থেকে নুন তৈরি করে, কেউ মাটি থেকে স্বর্ণরেণুর খোঁজ করে, কেউ পরের ভাগাড় বন্দোবস্ত নেয়, কেউ চিহ্নি শাক খুঁটে নিয়ে গিয়ে পেট ভরায়, কেউ হাসপাতালের জমাদার, কেউ শুয়োর চরায়, কেউ রিক্সা চালায়, কেউ কচ্ছপ, কাঁকড়া ধরে পেট চালায়, কেউ বাসের খালাসি, কেউ আবার চোলাই মদ প্রস্তুতকারক এবং যোগানদার। আঞ্চলিক ভূগোলের প্রেক্ষাপটে উঠে আসা ওই সমস্ত শ্রেণিচরিত্র কোনোপ্রকার কাল্পনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে আসেনি, উঠে এসেছে একেবারে বাস্তবের ভিত্তিভূমি থেকে। এদের জীবনের বিষাদ-বিরহ-দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা-ঘাত-প্রতিঘাতের দিকগুলি বৃহত্তর পরিসর নিয়ে উঠে এসেছে। এত বিচিত্র শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রকে উপন্যাসের আয়তক্ষেত্রের মধ্যে তুলে আনতে পেরেছিলেন তিনি কারণ এই জীবন সম্পর্কে তিনি নিবিড় ভাবে, গভীর ভাবে পরিচিত ছিলেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যাপ্ত ছিল বলেই অত ধরনের মানুষের জীবন নিয়ে পসরা সাজাতে পেরেছিলেন উপন্যাসের আসরে। লেখালেখির জগতে একজন লেখকের কাছে সবথেকে বড় মূলধন হল অভিজ্ঞতা।

অনিল ঘড়াই নিজে একজন অন্ত্যজ সমাজের মানুষ। তিনি নিজে দরিদ্র, অসহায় পরিবার ভুক্ত ছিলেন। জীবনে দুর্দশা, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা নিজে ভোগ করেছিলেন, নিজের পরিবারকে ভোগ করতে দেখেছিলেন।

> "অনিল ঘড়াইয়ের পিতা-মাতা দুজনেই ছিলেন কালীগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। আর্থিক অসচ্ছলতার পাশাপাশি জুটেছিল সামাজিক অসম্মান। জীবনের এই 'বাম' মুখ দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি, 'কষ্টের শ্যাওলা' জমেছে জীবনে, দেখেছেন গ্রামীণ সমাজে অনেকরকমের জ্বালা যন্ত্রণা, অপমান লাঞ্ছনা আর বৈষম্যের বীজ।"[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এইসব দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন, সমৃদ্ধ হয়েছেন, জীবনের স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জন্য দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অদ্ভুত জীবনের মর্ম ভালো ভাবে বুঝতেন, এই জীবনের ব্যথাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই এই জীবনের মর্মবেদনা নিয়ে একের পর এক উপন্যাস লিখে গেছেন। এই জীবনের একজন হয়ে জীবনকে দেখার, অনুভব করা অভিজ্ঞতা অনিল ঘড়াইয়ের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ছিল। তন্নিষ্ট মন নিয়ে জীবনকে দেখতে, বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই জীবন নিয়ে এত সংখ্যক উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতাই তাঁকে অন্ত্যজজীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার রসদ যুগিয়েছিল। অন্ত্যজ মানুষদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে যাওয়ার জন্য কথাকার অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসগুলি নতুন ঘরানা লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাসে প্রেম, যৌনতা, চরিত্রদের মানসিক দ্বন্দু বড় হয়ে ওঠেনি। অন্ত্যজ জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রেম, কাম, যৌনতাকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে না দিয়ে দলিল জীবন, নিম্নবর্গের মানুষের কথা নিয়ে উপন্যাস লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। মূলতঃ নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপনের উত্তাপ, বাঁচার সংগ্রাম তাঁর উপন্যাসের মূল সুর। বাঁচার লড়াই, লড়াইয়ের হেরে যাওয়া, খেটে খাওয়া, হতদরিদ্র মানুষজনের প্রকৃত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে তাঁর লেখনী দিয়ে। এদের জীবনকে রূপদান করার মধ্য দিয়েই তাঁর বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক সত্তার পূর্ণ উদ্ভাসন ঘটেছে। জীবনের বহু বিচিত্র রূপচ্ছবি নির্মাণের পথ ধরে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জেগে থাকে পাঠকের মনোলোকে। নামগোত্রহীন, অপাংক্তেয় অবহেলিত মানুষেরা তাঁর রচনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলার গ্রামের জীবন, বস্তির জীবন, আদিবাসী কুলি-কামিন, দিনমজুর, অন্তেবাসী মানুষ তাদের সমগ্রতা নিয়ে বিকশিত হয়েছে। এইখানেই তাঁর রচিত সাহিত্য ব্যতিক্রমী। তিনি উপন্যাসে অবহেলিত-দলিত মানুষদের মহাকাব্য রচনা করেছেন। এদের জীবন, সংস্কৃতি, সংগ্রামী চেতনা, ভাষার ডকুমেন্টশনই সাহিত্যের মাধ্যমে করে গিয়েছেন কথাসাহিত্যিক অনিল ঘড়াই।

উপন্যাসকার অনিল ঘড়াইয়ের অন্ত্যজ জীবনকে নিয়ে রচিত একটি অনবদ্য সৃষ্টি ‘মুকুলের গন্ধ’ (১৯৯৩)। অন্ত্যজদের কোনো একটি শ্রেণিকে নিয়ে নয়, একই সঙ্গে একাধিক শ্রেণির কথা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। মেথর, মুচি, হাড়ি, শুয়োর পালক এদের জীবনচিত্র উঠে এসেছে ‘মুকুলের গন্ধ’ উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে। যে এলাকার জীবনচিত্র উঠে এসেছে সে সম্পর্কে লেখক সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে উপন্যাসের কাহিনি থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় ডিভিসি অর্থাৎ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধ সংলগ্ন এলাকার জীবনচিত্র উঠে এসেছে। এখানকার মাটির রঙ ‘সাঁওতাল যুবতীর’ মতো। এই মাটিতে বেড়ে ওঠা, বড় হওয়া মুচি, মেথর, হাড়ি, শুয়োর পালকদের জীবনযাপন প্রণালী রূপ লাভ করেছে এই উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে।

উপন্যাসে জগেন-আন্নাকালীর সংসারের চিত্র উঠে এসেছে। জগেন-আন্নাকালীর জীবনপ্রবাহকে দেখাতে গিয়ে লেখক পার্শ্ববর্তী সমাজের কথাকেও তুলে ধরেছেন। জগেন-আন্নাকালীর শত দুঃখময় জীবন, জীবনে নানা সমস্যা, নানা সমস্যার কারণে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঠোকাঠুকি, মারামারি চলতেই থাকে প্রতিদিন। কলহ-বিবাদমুখর প্রতিদিনের এই জীবন, এই জীবনের রস, এই জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন লেখক উপন্যাসের প্লট বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। জগেন ডাকাত বংশের ছেলে। তার বাবা-দাদুরা নাম করা ‘সিঁদেল চোর’ ছিল। কিন্তু জগেন ওই পথে যায়নি। সে একটু অন্যভাবে বাঁচতে চেয়েছে, ভালো করে জীবনটাকে যাপন করতে চেয়েছে। তাই সে মেথরের কাজ বেছে নিয়েছে। নিজের এলাকার হাসপাতালে সাফাইওয়ালার কাজে সে লেগে পড়ে। হাসপাতালের সমস্ত নোংরা, ময়লা, দুর্গন্ধ যুক্ত জায়গা প্রতিদিন পরিষ্কার করাই তার কাজ। নোংরা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও সে মাইনে খুব একটা পায় না। খুব কম মাইনেতে তাকে মেথরবৃত্তি করে যেতে হয়। এর বাইরে বাড়তি রোজগারের কোনো রাস্তাও তার কাছে খোলা ছিল না। তাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটত জগেন-আন্নাকালীর। ঘরে নেই নেই লেগেই থাকত। সেই চরম অভাবী সংসারের চিত্রটি উঠে এসেছে উপন্যাসের শুরুতে। সমাজ সচেতন শিল্পী অনিল ঘড়াই ‘মুকুলের গন্ধ’ উপন্যাসে একই সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির কথা তুলে ধরেছেন। মুচি, মেথর, হাড়ি, শুয়োরের রাখাল এই সমস্ত শ্রেণির ভিন্ন রূপকে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক শ্রেণির আদব-কায়দা, জীবনাচরণ যে ভিন্ন ছিল সেগুলি সচেতনভাবে বজায় রেখে প্রত্যেক শ্রেণির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কে কোথায় কেন পিছিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন একেবারে বাস্তবসম্মতভাবে। ‘মুকুলের গন্ধ’ উপন্যাসটি লেখকের অন্ত্যজ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজভাবনার এক অভিনব শিল্প সমন্বিত আত্মপ্রকাশ। এর সঙ্গে আছে ভাষাশৈলী। প্রত্যেকটি সমাজের ব্যবহৃত ভাষার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। সেখানেও লেখক সম্পূর্ণভাবে সচেতন।

'কলের পুতুল' (১৯৯৬) উপন্যাসে লেখক খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে এনেছেন। জীবনের বিভিন্ন দিকের সমন্বিত রূপ হল 'কলের পুতুল' উপন্যাসটি। তারই একটি দিক হল বস্তিজীবন। বস্তিজীবন, সেই জীবনের প্রখর বাস্তবতার স্বরূপটি উঠে এসেছে উপন্যাসের আখ্যানভাগের একটি অংশে। তবে এই বস্তিজীবন কোন্ অঞ্চলের সে সম্পর্কে লেখক সুস্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কাহিনি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সূত্র, ইঙ্গিত থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, এখানে বাঁকুড়া জেলার শালবনী অঞ্চলের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। কারণ, শালবন ঘেরা অঞ্চল, শালগাছের উপর এখানকার মানুষের নির্ভরতা, রুক্ষ এলাকার কথা কাহিনির মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। সেই সূত্রে বলা যায়, উপন্যাসকার অনিল ঘড়াই এখানে শালবনী অঞ্চলের বস্তিজীবনের প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। রুংলী-ঘোসুদের মতো নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনস্বরূপ তুলে ধরার ক্ষেত্রে লেখক যেরকম পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেইরকম পারংগমতার পরিচয় দিয়েছেন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। সবমিলিয়ে সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে উপন্যাসকার অনিল ঘড়াইয়ের 'কলের পুতুল' উপন্যাসটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' (১৯৯৭) উপন্যাসটি অন্ত্যজজীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াইয়ের একটি অভিনব প্রয়াস। অন্ত্যজশ্রেণির মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র একটা জনজীবন উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। আদিবাসী জনজীবন, জনজীবনের যাপনচিত্র, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সমস্যা-সংকট - এই সমস্ত অনুপুঙ্খ দিক নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' উপন্যাসটি কায়া। মুন্ডা, কোড়া, হো সম্প্রদায়ের মানুষের কথা নিয়েই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি। কেবলমাত্র অজানা জনজীবন নয়, অজানা ভৌগোলিক পরিমণ্ডলও উপন্যাসটির অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। একেবারে প্রত্যন্ত এক অঞ্চলের জীবনচিত্র উঠে এসেছে, সেখানকার আশেপাশের অঞ্চল পাহাড়, টিলা, ছোটোনদী, জঙ্গলে আকীর্ণ। এই উপাখ্যান বিহারের আদিবাসী জনজাতির আখ্যান। উপন্যাসে পশ্চিম সিংভূম অঞ্চলের কথা উঠে এসেছে, সেই অঞ্চলের মানুষের কথা বিবৃত হয়েছে। এই অঞ্চলের দৌড়বোনালায় কিংবা রংকুট পাথর চাট্টানে সোনা খোঁজার আজন্ম তৃষ্ণা নিয়ে একদল মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে সেই কথা নিয়েই রচিত হয়েছে এই উপন্যাসটির কাহিনি।

'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১) উপন্যাসটি অনিল ঘড়াইয়ের এক অসামান্য সৃষ্টি। কেবলমাত্র অনিল ঘড়াইয়েরই নয়, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অন্ত্যজজীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে 'নীল দুঃখের ছবি' উপন্যাসটি এক অসামান্য সংযোজন। লেখক যে ধরনের মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন এখানে সেটা একেবারেই বিরল। এই ধরনের মানুষদের নিয়ে খুব কমই গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। এটা অনিল ঘড়াইয়ের মতো লেখকের পক্ষেই সম্ভব। এই উপন্যাসের পটভূমি হল মেদিনীপুরের গ্রাম, বাংলা ওড়িশার সীমান্ত এলাকা। এই এলাকার গ্রামবাংলার জীবনচিত্র উঠে এসেছে। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাওয়া কাকমারা সম্প্রদায়ের জীবনকথা নিয়েই এই উপন্যাসের প্লট নির্মিত হয়েছে। জীবনেরও যে কত ধরন আছে, তারও যে কত বিচিত্র রূপ দেখা যায় তারই একটা নজির হল কাকমারাদের জীবন। জীবনে কীভাবে টিকে থাকতে হয়, কীভাবে সংগ্রাম করতে হয় তার বাস্তব রূপটিকে তুলে ধরেছেন কাকমারাদের জীবনকে আশ্রয় করে। বিভিন্ন পশুপাখি মেরে, সারাদিন ঘুরে ঘুরে এদের দিন কাটে। এদের জীবনের সম্বল হল শুয়োর। কোথাও একজায়গায় এক নাগাড়ে বেশিদিন তারা কাটাতে পারে না। স্থায়ী জীবনযাপন তাদের ভালো লাগে না, তাদের কপালেও লেখা থাকে না। যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাদের জীবনপাত হয়। পথেই তাদের সংসার পাততে হয় আবার সংসার গোটাতে হয়। পথ চলাতেই তাদের জীবনের আনন্দ। শুয়োরের পাল নিয়ে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরেই চলেছে। এদের জীবনের বিবরণ দিয়েছেন লেখক —

> "ওরা ঘুরতে-চরতে ভালবাসে। বাঁধা জলের জীবনে ওদের ঘোরতর আপত্তি। তাই মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তে হয় পেটের টানে।"[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথাকার অনিল ঘড়াই কাকমারাদের জীবনের সামগ্রিক স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। তাদের জীবনের কোনো দিক তাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি। উপন্যাসের কাহিনির সর্বাংশ জুড়ে আছে এরাই। এদের জীবন, এদের সমাজ, এদের পারিপার্শ্বকে তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক কাহিনির মধ্যে দিগম্বর-বিদ্যাধরীর সম্পর্কের দ্বান্দুকি চিত্রটিকেও তুলে ধরেছেন। দিগম্বর-যমুনাবতীর বিবাহিত জীবনের মাঝে এসে পড়ে বিদ্যাধরী। বিদ্যাধরী স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে তার ভালোলাগার পুরুষ দিগম্বরের কাছে এসে পড়ে। দিগম্বরের সঙ্গে বিদ্যাধরীর সম্পর্ককে ভাল নজরে দেখেনি যমুনাবতী। তাই সে বিদ্যাধরীর উপর ঝাপিয়ে পড়েছে, শারীরিক ভাবে তাকে আঘাত করেছে, তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে দিগম্বরের কাছ থেকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত যখন পেরে ওঠেনি তখন যমুনাবতী নিজেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং গলায় দড়ি নিয়ে আমগাছ থেকে ঝুলে পড়েছে। এইভাবে একদিকে কাকমারাদের সমাজদর্শন অন্যদিকে দিগম্বর-বিদ্যাধরী-যমুনাবতীকে নিয়ে সম্পর্কের জটিলতা উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। কাহিনি শুরু হয়েছে এদের নিয়েই আবার কাহিনির সমাপ্তিতেও এদেরই পাওয়া যায়। এককথায় 'নীল দুঃখের ছবি'-তে সর্বাংশ জুড়ে আছে কাকমারারা। এই দুয়ের সমন্বয়ে এদের জীবনচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক এদের ভাষাশৈলীকেও তুলে ধরেছেন। এরা কোন্ ভাষায় কথা বলে, কীভাবে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করে- এই সবই লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এইভাবে কাকমারাদের জীবন, এদের জীবনের ভাবভঙ্গি, ভাষা সব নিয়ে 'নীল দুঃখের ছবি' উপন্যাসটি অন্ত্যজ জীবনের একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে।

উপরের উপন্যাসগুলি ছাড়াও কথাকার অনিল ঘড়াইয়ের আরও অনেক উপন্যাস রয়েছে, যেগুলির ছত্রে ছত্রে অন্ত্যজজীবন বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। তাই ওই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে দু-চার কথা না বলে পারা যায় না। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নুনবাড়ি'-র (১৯৮৯) কথা। এই উপন্যাসে নুনমারা সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে। নুন মারার সমস্ত পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় পূর্ণ আছে এখানে। পূর্ব মেদিনীপুরের নোনাখাল, গঞ্জের হাট তৎসন্নিহিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের পটভূমি। চরদাগানো থেকে শুরু করে চুঁছনি দিয়ে নুনমাটি তোলা, পাশাপাশি গর্ত খুঁজে প্রথমটিতে নুনমাটি আর দ্বিতীয় গর্তে কলসি বসিয়ে নুনজল ধরে নেওয়া, নুনবান অর্থাৎ নুনজল জ্বাল দেবার চুলা তৈরি করা, ঘোগার হাত থেকে নুনবাড়ি বাঁচানো ইত্যাদির অনুপুঙ্খ ব্যবহারে নুনমারাদের জীবনালেখ্য নির্মাণ করেছেন অনিল ঘড়াই। এর আগে বাংলা উপন্যাসে এই ধরনের বিষয় আসেনি। সমাজের নুনমারাদের মতো ব্রাত্যশ্রেণির জীবনচিত্র নিয়ে রচিত এই উপন্যাসটি প্রকৃত অর্থে অভিনবত্বের দাবিদার।

উপন্যাসটি নায়িকা প্রধান, যার নাম লবঙ্গ। উপন্যাসটি নুনমারা সম্প্রদায়ের একটি অবহেলিত নিম্ন সমাজের মেয়ের ঘুরে দাঁড়ানো কাহিনি। অসহায়তা আর অপমান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় আর প্রচেষ্টা নিয়ে লবঙ্গর জীবন সংগ্রাম। নারীচরিত্র প্রধান হওয়ায় মলঙ্গী সমাজের জীবন চিত্রণের পাশাপাশি একটা প্রেমের চিত্রও উঠে এসেছে। লবঙ্গ সমাজ সংসার মেনে স্বামী কালাচাঁদকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীর কালাচাঁদের মন পড়ে আছে অন্য মেয়ের প্রতি। তাই স্বামী সুখ পায়নি লবঙ্গ। সেই সঙ্গে সংসার সুখও পায়নি। শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করে তার দিন কাটত। শেষ পর্যন্ত স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে লবঙ্গ তার আদরের বাচ্চাছেলে নোনাইকে নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয় বাবা জটায়ুর কাছে। নোনাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাপের বাড়ির পূর্ব-পুরুষের জীবিকা নুন মারাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইল লবঙ্গ। এই সূত্রে লেখক নুন তৈরি এবং নুনমারাদের মতো নিম্নবর্গের মানুষের জীবনস্বরূপকে তুলে ধরেছেন। এদের জীবনের কঠিন রূপটিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে লেখক লবঙ্গ চরিত্রটিকে আশ্রয় করে নুনমারা সম্প্রদায়ের মানুষের বেঁচে থাকার, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের কথাকে তুলে ধরেছেন। জীবন সংগ্রাম উপন্যাসে নুন আর নারীকে এক করে তুলেছে। নুন আর নারীর আশ্চর্য যুগলবন্দী রূপটি উঠে এসেছে উপন্যাসে —

> "নুনবাড়ি থেকে নুনজল পড়ছে টুপটাপ। পেতে রাখা মাটির কলসিতে সেই জল পড়ার মোহময় শব্দ। সেই শব্দের সঙ্গে যেন তার বেঁচে থাকার শব্দের হুবহু মিল। ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে লবঙ্গের। ঘোলা চোখে সে দেখছে কলসি ভরছে। হাজার, হাজার, লক্ষ লক্ষ ফোঁটায় এক সময় কলসীটা কানায় কানায় ভরে ওঠে। হয়তো উথলেও পড়বে। কিন্তু তার কি হবে? অশৌচ কলসির মত ফাঁকা এই দেহটা নিয়ে সে আর কতকাল একলা হাঁটবে?"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'বনবাসী' (১৯৯০) উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের ছবি উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের পটভূমি হল সিংভূমের পাহাড়ি অঞ্চল। কর্মসূত্রে লেখক এই সময়টাতে ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমের চক্রধরপুরে ছিলেন, সেখানে অদূরেই বিনজয় নদী, চ্যালাবেড়া পাহাড়, বনজঙ্গল। এই অঞ্চলের আদিবাসী পুরুষরা সারাদিন হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকে, মেয়েরা ট্রাকে চেপে দূরে চলে যায় খাটতে, ঘরে যারা থাকে তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এদের জীবন। তাই তাদের জীবনে ভূত, ডাইনির বড় উপদ্রব। আর আদিবাসী মেয়েদের আছে যৌবন আর তার যন্ত্রণা। আদিবাসী জনজীবনে এই সব চালচিত্র উঠে এসেছে 'বনবাসী' উপন্যাসে। এদের জীবন নিয়েই উপন্যাস। লেখক এই উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের কোন আদর্শগাথা লিখতে চাননি, সুখ-দুঃখ, হতাশা আর হাড়ভাঙা খাটুনিতে গাঁথা এদের জীবনের ছবিই তিনি তুলে ধরেছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আদিবাসীদের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের সমান্তরালে রয়ে গেছে ক্রমশ বিবস্ত্র বনভূমি, কাক আর শকুনের চিৎকার, মরা ইঁদুর আর ছাগলের দুর্গন্ধ। নিজের চোখে দেখা জীবন অভিজ্ঞতাকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন লেখক এই উপন্যাসে। চোখে দেখা জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক —

> "নেশায় কত মানুষকে শেষ হয়ে যেতে দেখেছি দিনের পর দিন। কোন সচেতনতা নেই, কেবলই অবক্ষয়। বন কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে কুঠারে। নব্য আধুনিকতার গরলটুকু গায়ে মেখে নিচ্ছে অজ্ঞ মানুষ। মানুষ চোখের পাতা উল্টে দিনের পর দিন কৌশলে ঠকাচ্ছে মানুষকে। যুবতীর ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে লড়াইয়ের মোরগ। যার মোরগ জিতবে মেয়েটি হবে তার। নারী স্বাধীনতার বিপন্ন হাহাকার এখনও সিংভূমের বাতাসে।"[৪]

'মেঘ জীবনের তৃষ্ণা' (১৯৯৬) উপন্যাসে পরিপূর্ণভাবে হাড়ি সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে। তাদের সংস্কৃতি, লোকাচার, সংস্কার, কুসংস্কার, ঐতিহ্য প্রভৃতিকে দেখিয়েছেন এদের জীবন এবং জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এদের জীবনের গোপন দুঃখকথাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা এবং দীঘা পার্শ্ববর্তী এলাকা পানিপারুল, চোরপালিয়া, এগরা, হাড়িসাই হল এই উপন্যাসের ভৌগোলিক এলাকা। এই এলাকার হাড়িদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের চিত্র উঠে এসেছে উপন্যাসের পরতে পরতে। এরা কেউ মৃত পশুর 'চাম' ছাড়ায়, কেউ হাসপাতালে ঝাড়ু দেয়, কারোর কাজ বেআইনি হাড় চালান দেওয়া, বালিগড় পাচার করা, আবার কারোর কাজ ঢোল বাজানো। সমাজের এইধরনের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের সমস্যা, তাদের ইচ্ছা, তাদের অধিকার প্রভৃতি দিকগুলি কাহিনিবদ্ধ রূপ লাভ করেছে এই উপন্যাসে।

নিম্নবর্গীয় নিঃস্ব মানুষের জীবনকথা নিয়ে রচিত তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'বিপরীত যুদ্ধের মহড়া' (২০০১), 'সামনে সাগর' (২০০৩)। 'বিপরীত যুদ্ধের মহড়া' উপন্যাসে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার অন্তর্গত অখ্যাত 'নামকা' গ্রামের কথা উঠে এসেছে। এই গ্রামের প্রান্তবর্গীয় সাদামাটা সহজ-সরল মানুষের জীবনযাত্রার ছবি লক্ষ করা যায় এই উপন্যাসে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলধর, যার জীবিকা হল চাম ব্যবসা। এই ব্যবসা তাদের জাত ব্যবসা। হলধরের অন্য দু-ভাই জাতব্যবসা ছেড়ে উপার্জনের নতুন পথ খুঁজেছে। ছোট ভাই ভাগ্যধর হয়েছে চাষের কাজের জনমজুর, মেজভাই কাঁথি শহরে মিউনিসিপ্যালিটির জমাদারের কাজ নিয়েছে। এইভাবে চামড়ার ব্যবসা, সেই ব্যবসা ছেড়ে যাওয়ার কাহিনি এবং তার সঙ্গে কিছু উপকাহিনি যুক্ত হয়ে উপন্যাসের প্লট নির্মিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক চামড়ার ব্যবসার খুঁটিনাটি, গরুর ব্যবসার খুঁটিনাটি দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন এবং জাতব্যবসাকে আঁকড়ে থাকা সমাজের একটি প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের জীবনস্বরূপ তুলে ধরেছেন। আর 'সামনে সাগর' উপন্যাসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘার জনপদ অঞ্চলের অন্ত্যজ গ্রাম বাংলার অধিবাসীদের জীবনকথা উঠে এসেছে।

> " 'সামনে সাগর' উপন্যাসটি নোনাজল, নোনা হাওয়া, নোনা মাছ আর নোনতা প্রেম নিয়ে লেখা।... শ্রমজীবী ভূমিহীন সহায় সম্বলহীন কিছু মানুষ দীঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে আজও বেঁচে আছে। তারাই এই উপন্যাসের কুশীলব। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার জানাশোনা, সখ্যতা। অনেক রাত সমুদ্রধারের মাছঘাটিতে কেটে গেছে আমার। মাছ বাছাইয়ের রীতিনীতি বড়ই বিচিত্র। 'সামনে সাগর'-এ এসবই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।"[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই উপন্যাসটিও অসহায়-অবহেলিত মানুষের জীবনযাত্রার একটি দলিল। এরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে। এই সংগ্রাম নোনাজল এবং সেই জল থেকে মাছ সংগ্রহ করাকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে থাকে।

এইভাবে অনিল ঘড়াইয়ের এক-একটি উপন্যাসে সমাজের অন্ত্যজদের এক-একটি শ্রেণির স্বরূপ উঠে এসেছে। তাঁর এক-একটি প্রচেষ্টা অন্ত্যজ সমাজের এক-একটি শ্রেণির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়েছে। নিম্নবর্গের কোন একটি বিশেষ শ্রেণির জীবনকথাকে নিয়ে তিনি একাধিক উপন্যাসে চর্বিত-চর্বন করেন না। তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডারটি এতটাই প্রসারিত ছিল যে প্রত্যেকটি উপন্যাসে তিনি নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক দিগন্তকে উন্মোচিত করেছেন, নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর নব নব ভুবনের সন্ধান দিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের জগতে অন্ত্যজ জীবনকে তুলে ধরার ইতিহাসে অনিল ঘড়াইয়ের প্রত্যেকটি উপন্যাসই অনন্য হয়ে আছে।

কথাকার অনিল ঘড়াইয়ের প্রত্যেকটি উপন্যাসই বিচিত্রমুখী। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা থেকে লেখক নিম্নবর্গের বিচিত্র শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন, বিবিধের পসরা সাজিয়েছেন সাহিত্যের আসরে। বিষয় নির্বাচনে তিনি সতত অভিনবত্বের অভিসারী। নিখুঁত বর্ণনায় তুলে এনেছেন অন্ত্যজদের এক-একটি নিটোল সমাজজীবন। মূর্ত হয়ে উঠেছে হরেক রকমের বাস্তবতা। এদের নাম, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, পেশা, জীবনচর্যা প্রভৃতি সবটা নিয়ে উঠে এসেছে দলিত জীবনের স্বরূপ। এদের নামই চিনিয়ে দেয় এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে। তাঁর উপন্যাস-গল্পের মূল সুরই হল অন্ত্যজ, প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবনায়ন। অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসের হাজারো চরিত্র বাংলা সাহিত্যের পরিসরকে বিশাল বিস্তৃত করেছে। এককথায় তিনি 'অন্ত্যজ মানবের মহাভারত' রচনা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি কোনো চাতুর্যের আশ্রয় নেননি, ভর করেছেন সুবিশাল অভিজ্ঞতার উপর। তাঁর উপন্যাসে নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র উঠে এসেছে ভিন্ন আস্বাদনমানতা নিয়ে। কারণ লেখক নিজে জন্মগত দিক থেকে এই সমাজভুক্ত ছিলেন। নিজে এই সমাজের একজন হয়ে এই সমাজকে দেখার, এই জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার শিল্পায়ন ভিন্ন ঘরানা লাভ করেছে, নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাসে স্বশ্রেণির দুঃখ, যন্ত্রণার অনুভূতি অনেক বেশি সংরাগ রক্তিম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই জায়গায় তিনি স্বতন্ত্র হয়ে আছেন, অনন্য হয়ে আছেন।

কথাকার অনিল ঘড়াইয়ের সমগ্র সাহিত্য জগতে আদিবাসী জীবন, নিম্নবর্গীয় দলিত মানুষ, গ্রামীণ জীবন ও অন্ত্যজ মানুষের কথাই প্রধান উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের মানুষদের নিয়ে তিনিই প্রথম গল্প-উপন্যাস লিখছেন এমনটা নয়। তাঁর আগে অনেকেই এই ধরনের জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাহলে আবার কেন অনিল ঘড়াইকে নিয়ে আলোচনা? আলোচনার প্রয়োজন আছে অন্ত্যজ জীবনের নতুন ভুবনের অনুসন্ধানের জন্য। নিম্নবর্গীয় দলিত মানুষ, অন্ত্যজ মানুষের কথা নিয়ে উপন্যাস রচনা করেও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্বে এবং রচনাশৈলীর গুণে উপন্যাসকার অনিল ঘড়াই নতুন জগতের দিশারি হয়ে আছেন। অন্ত্যজজীবন নির্ভর কথাসাহিত্যে তিনি পৃথক জায়গা করে নিতে পেরেছেন। এমন এমন জনগোষ্ঠীর কথাকে তিনি তুলে ধরেছেন, যা উপন্যাসের ইতিহাসে এই প্রথম। বিষয়গত দিক থেকে অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসের বিস্তৃতির কথা তুলে ধরে তাঁর স্বতন্ত্র স্থানটিকে সূচিত করে সমালোচক কামরুজ্জামান বলেছেন—

> "কাউকে ছোটো না করেই বলছি তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি, সমরেশ, সতীনাথ, বনফুল, ভগীরথ, ঝড়েশ্বর, নলিনী, স্বপ্নময় এঁদের দলিত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সে রকম কোথায়! প্রকৃত অর্থে দলিত মানুষ ও তার জীবনের ভুক্তভোগী যথার্থকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে অদ্বৈত মল্লবর্মণের। তারপর অনিল ঘড়াই।"[৬]

কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, এই জীবনকে দেখার ভঙ্গিটাও তাঁর স্বতন্ত্র ছিল। একেবারে পৃথক ঘরানায় অন্ত্যজ জীবনের প্রখর বাস্তব রূপটিকে পরতে পরতে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি দৃষ্টিভঙ্গি অভিনবত্বের কারণে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক শ্রাবণী পালের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়, তারাশঙ্কর কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আমরা এইসব প্রান্তিক মানুষের বিচারণা দেখেছি। কিন্তু উচ্চশ্রেণী কিংবা মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সেই দেখায় কোথাও যেন একটা রোমান্টিকতার অবকাশ ছিল। অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঠিক সেরকম নয়।"[৭]

সামগ্রিক বিচারে, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অনিল ঘড়াই স্বতন্ত্র একটি ভুবন। কথাবস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, রচনা শৈলীগত দিক থেকে কথাকার অনিল ঘড়াই এক ব্যতিক্রমী নাম, স্মরণীয় নাম, এক অবিসংবাদী নাম। অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের বয়ান মূলত প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের জীবন সংগ্রাম, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, শ্রম, অস্তিত্ব সংকট এবং মানবিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। তাঁর চরিত্ররা কেবল অসহায় বা করুণার পাত্র নয়; তারা প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনকে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। গ্রামীণ সমাজ, লোকসংস্কৃতি, প্রকৃতি ও শ্রমজীবনের সঙ্গে অন্ত্যজ মানুষের গভীর সম্পর্ক তাঁর উপন্যাসে বাস্তব ও মানবিক হয়ে উঠেছে। ফলে অনিল ঘড়াইয়ের কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবনকে দৃশ্যমান করার পাশাপাশি সমাজের বৈষম্যমূলক কাঠামো সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। তাঁর উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের এই মানবিক ও বাস্তবধর্মী উপস্থাপনাই তাঁর সাহিত্যকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করেছে।

Reference:

১. পাল, শ্রাবণী, 'অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাস : ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত', 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, কলকাতা, পৃ. ২০২-২০৩
২. ঘড়াই, অনিল, 'নীল দুঃখের ছবি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ০৯
৩. পলমল, অরূপ, 'অনিল ঘড়াই-এর উপন্যাস : পূর্ব মেদিনীপুর ও আঞ্চলিক জনজীবন', 'সৃজন' সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয় পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪, পশ্চিম মেদিনীপুর, পৃ. ১১২-১১৩
৪. ঘড়াই, অনিল, 'আঁতুড় কথা', পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৬৪
৫. তদেব, পৃ. ১৬২
৬. কামরুজ্জামান, 'অনিল ঘড়াই : অন্ত্যজ মানুষের অশোকস্তম্ভ', 'সৃজন' সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪, পশ্চিম মেদিনীপুর, পৃ. ৪১
৭. শ্রাবণী পালের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ২০৪